

GILLETTE & L'ORÉAL, WOMEN USA

VOL. III

Kentucky • Louisiana • Maine • Maryland
Massachusetts • Michigan • Minnesota • Mississippi



FERDINANDO FREGA

GILLETTE & L'ORÉAL, WOMEN USA — VOL. III

L'ORÉAL THROUGH GILLETTE · 08

কেন্টাকি, লুইজিয়ানা, মেইন, মেরিল্যান্ড, ম্যাসাচুসেটস, মিশিগান,
মিনেসোটা, মিসিসিপি। আমেরিকা পারাপারের তৃতীয় পর্ব, ওহাইও
উপত্যকা থেকে ডেল্টা পর্যন্ত।

শূন্য অধ্যায় — সব খণ্ডের এক সূচনা

এই সূচনা-অধ্যায়টি *Women of the United States*-এর ছয়টি খণ্ডেই
এক। এখানে তা পুরোটাই দেওয়া হল, আর গুটিয়ে রাখা হল, যাতে
সিরিজটি পুনরাবৃত্তি ছাড়াই পরপর পড়া যায়।

শূন্য অধ্যায়

এখানে পৃথিবী কোনো ভূখণ্ড নয়: এক সীমা। উত্তর মেরু স্বাগত জানায়
না, ক্ষমা করে না, ভুলের কোনো জায়গা রাখে না। সাদা এখানে রাজত্ব
করে এক নিরঙ্কুশ সত্তা হয়ে — নীরব, স্মৃতিহীন। তাপমাত্রা এখানে
আবহাওয়ার তথ্য নয়: সে এক শিকারি। রাত চলে মাসের পর মাস,
চিন্তাকে পিষে দেয়, মানুষের আকার বিকৃত করে, তাদের ইচ্ছাশক্তি
গিলে খায়।

জনগোষ্ঠী অল্প, ছোট, বন্ধ। ইনুইট, ইউপিক, আর্কটিকের মানুষেরা বাস
করে সেখানে, যেখানে কেউ থাকতে চাইত না। এখানে প্রত্যেকটি মানুষ
দলের টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য। তুমি কাজে না লাগলে বোঝা হয়ে
যাও। আর যারা বোঝা হয়ে যায়, তারা হারিয়ে যায় নীরবতায়, বরফে,
এমন এক পরিবেশের যুক্তিতে, যা কোনো ছাড় দেয় না।

বৈজ্ঞানিক ঘাঁটিগুলো যোগ করে আরেক রকম শীত: ক্ষমতার সিঁড়ির
শীত। এখানে নারী এক বিরল উপস্থিতি, এক ব্যতিক্রম, যাকে হয় মানিয়ে
নিতে হয়, নয়তো হার মানতে হয়।

এই জায়গায় “হারিয়ে যাওয়া” বলে কোনো ধারণা নেই। আছে শুধু সাদা, যা সব মুছে দেয়।

ইনুইট ও ইউপিক নারীরা

আর্কটিকের মেয়েকে আদর দিয়ে বড় করা হয় না: তাকে তৈরি করা হয়। খুব তাড়াতাড়ি সে শেখে শীত, অন্ধকার আর খিদে সহ্য করতে। তাকে গোষ্ঠীর কাজে লাগতে হবে, কারণ এখানে পরিচয় ব্যক্তিগত নয়। তা কার্যকরী। পরিবার আর সমাজের ভার বয় নারী: খাবার, আগুন, সন্তান, চামড়া, সেবা। অধিকারের কথা কেউ বলে না। ভঙ্গুরতার কথা কেউ বলে না। বিষণ্ণতা আছে, কিন্তু তার কোনো নাম নেই। হিংসা আছে, কিন্তু তার কোনো সাক্ষী নেই।

বৈজ্ঞানিক ঘাঁটির নারী

শিক্ষিত, দক্ষ, শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত। সে আসে গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, ডাক্তার হয়ে। খুব তাড়াতাড়ি সে আবিষ্কার করে যে উত্তর মেরু কোনো ডিগ্রি চেনে না। এখানে গোনা হয় শুধু মনের কাঠিন্য। পুরুষের ক্ষমতার সিঁড়ি তার ওপর চেপে বসে, আর দুর্বলতার যে-কোনো চিহ্নকে দুর্বলতা বলেই ধরা হয়। এ এমন এক পরিবেশ, যেখানে শক্তি যথেষ্ট নয়: চাই চরম আত্মসংযম।

পশ্চিমের “বহিরাগত” নারী

স্বাধীনতায় বড় হয়েছে, আসে এই বিশ্বাস নিয়ে যে সে শীতকে জয় করতে পারবে। কিন্তু জায়গাটা তাকে ভেঙে দেয়: একাকিত্ব, ছোট ছোট ঘর, অন্তহীন নীরবতা। ঘাঁটিগুলো সমাজ নয়, যন্ত্র। আর পুরুষের নকশা করা এক যন্ত্রের ভেতরে নারীকে লড়তে হয়, যাতে সে হারিয়ে না যায়।

পৃথিবীর কিনারায় যাত্রা

আমার প্রতিবেশী আন্তোনিও, সবাই যাকে নিনো বলে ডাকে, বছরের পর বছর ধরে নর্থ কেপের কথা বলত, মাঝরাতের সূর্যের কথা, অন্ধকারহীন মাসগুলোর কথা। স্বপ্নটা সে পকেটে রেখে দিয়েছিল, অসম্ভব কিছুর মতো। মে মাসের এক সকালে আমি তার দরজার ঘণ্টি বাজালাম আর

শুধু এটুকু বললাম: “সুটকেস গোছাও। এক ঘণ্টা পরে আসছি। 30 দিন পরে ফিরব।” সে অবাক হয়ে, খুশি হয়ে আমার দিকে তাকাল। তার স্ত্রী চিন্তিত মুখে জানতে চাইলেন, আমাদের পরিকল্পনা কী। “একটা স্বপ্নের পেছনে ছোট্টা,” আমি উত্তর দিলাম।

আমরা গাড়িতে উঠলাম। আমাদের স্ত্রীরা এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, যেন আমরা পাগল। কিন্তু এই যাত্রা ছিল সত্যি। নিনোর মাথায় তখনই প্রশ্নের পাহাড়। “কোথায় যাচ্ছি? কত টাকা নেব?” “নিশ্চিত থাকো,” আমি বললাম। “54 ঘণ্টায় পৌঁছে যাব। মাত্র 5,000 কিলোমিটার। আমরা নতুন Range Rover-এ। যাত্রাটা উপভোগ করো।”

প্রতি 300 কিলোমিটারে আমাকে থামতে হত: সে আমার চেয়ে বারো বছরের বড়, তার নিজের ছন্দ। আমার ছিল জল আর পানীয়; তার ছিল কফি আর শরীরের প্রয়োজন। আর যত এগোলাম, সে তত তার জীবনের কথা বলল। এমন সব কথা, যা ওই অন্তহীন রাস্তা না থাকলে আমি কোনোদিন জানতে পারতাম না।

গাড়িতে একা দুজন পুরুষ, সারাক্ষণ মেয়েদের কথা। সে জীবনে শুধু তার স্ত্রীকেই চিনেছে। আমি হাসলাম। তাকে আশ্বস্ত করলাম: “আমরাও তো একই রকম।”

সে জিজ্ঞেস করল, 60 ঘণ্টা গাড়ি চালিয়েও আমি মাথা ঠিক রাখি কী করে। আমি তাকে রাশিয়ার কথা বললাম — 22 বছর বয়সে এমন এক নারীর সঙ্গে দেখা করতে 51 ঘণ্টা গাড়ি চালিয়েছিলাম, যাকে আগে কখনও দেখিনি। “দূরত্ব কোনো সীমা নয়,” আমি তাকে বললাম, “ওগুলো অজুহাত। আমার কখনও কোনো অজুহাত ছিল না।”

সাদার মধ্যে পৌঁছানো

আমরা নরওয়েতে ঢুকলাম। রাস্তার ধারে একটা হোস্টেল। গাড়িটা সেখানে রেখে আমরা স্নেজে এগোব।

গাইড ছিল আপাদমস্তক ঢাকা, দুর্ভেদ্য। চশমা খুলতেই দেখলাম, সে এক নারী। এক নরওয়েজীয় নারী — নীরব, সোজাসাপ্টা, হিমশীতল।

নিনো স্লেজের মাঝখানে, সে সামনে, আর আমি আমার 190 সেমি নিয়ে পেছনে, সবার শেষে।

তখনও দিনের আলো। ঘড়ি সময় দেখাচ্ছিল, কিন্তু বলছিল না রাত না সকাল। এ ছিল মাঝরাতের সূর্য। আমরা নর্থ কেপে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

নিনো কেঁদে ফেলল। আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি হাসতে হাসতে বললাম, “সাবধান... লোকে ভাববে আমরা গে।” আমরা হাসলাম, কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম পৃথিবীর কিনারায়।

তারপর এল তুষারশীত: -52°C ।

আসল আর্কটিকে প্রবেশ

পোশাক বদলাতে ওরা আমাদের একটা ধাতুর কনটেইনারে নিয়ে গেল। ভীষণ ভারী, প্যাড-দেওয়া সুট, জটিল সব জিপে আটকানো।

গাইডের টাকা আমি দিলাম। নিনোকে রাখা হল একটা ইগলুতে কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে; আমাকে আরেকটায় এক পরিবারের সঙ্গে: এক বৃদ্ধ, বয়স 70 থেকে 80-র মধ্যে, আর তিনজন নারী, 30 থেকে 50-এর মধ্যে।

সে ছিল এক বন্ধ জগৎ। সরল। নির্মম।

পুরুষটি একপাশে সরে থাকত। নারীরা কাজের ছন্দ ধরে রাখত। আর বাথরুম ছিল ইগলু থেকে পাঁচ মিটার দূরের একটা টিবি: মাটিতে পড়ার আগেই গু জমে যেত। আমার প্রথম পেছাপ হয়ে গেল এক হলুদ আর্কটিক তারা। উত্তর আমাকে এভাবেই অভিবাদন জানাল।

মাঝবয়সি নারী, মাগি, অল্প ইংরেজি জানত। বাকিটা ইশারা, চোখ, হাত। শীতের ভাষা।

সুটটা কীভাবে পরতে হয় আমি যখন ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, সে কিছু না ভেবেই আমার দুই উরুর মাঝখানে ছুঁয়ে একটা লুকোনো জিপ দেখিয়ে দিল। তাতে কোনো কুমতলব ছিল না, কোনো লজ্জা ছিল না: শুধু কাজ। টিকে থাকা।

ইগলুতে তিন দিন

ওরা খাবার আনল। ধোঁয়ায় শুকোনো মাছ, কাঁচা মাছ, কডের যকুৎ, তিমির পেট। আর হাওরের বল। বেছে নেওয়ার কিছু ছিল না। বিকল্প ছিল না। প্রকৃতি যা দেয়, তাই।

তারপর আমি পান করলাম: একটা লাল তরল। ভেবেছিলাম ওয়াইন। সেটা ছিল ছাঁকা, ফোটানো, মিষ্টি করা তিমির রক্ত। আমি খেয়ে নিলাম। আমার শরীরে এমন এক শক্তি এল, যা আগে কখনও টের পাইনি। এক আদিম শক্তি। ভাবলাম কোকেন। না। ওটা ছিল উত্তর, শরীরের ভেতরে ঢুকছে।

নারীরা আমাকে লক্ষ্য করছিল। বৃদ্ধ শিকারে বেরিয়ে গেল। আমি বিশ্রাম নিলাম আর রক্ত খেলাম। তিন দিন — ফোন নেই, ইন্টারনেট নেই, কম্পিউটার নেই, নিনো নেই। শুধু আমি আর ওরা।

রাত বলে কিছু ছিল না। শুধু আলো, আগুন, বরফ আর নিঃশ্বাস।

তিন নারী ঘুমোতে শুয়ে পড়ল। আমি জায়গা খুঁজছিলাম। সবচেয়ে ছোটজন হাত তুলে আমাকে কাছে আসতে ইশারা করল। ওরা হো হো করে হেসে উঠল। আমি বুঝলাম না। ওরা বলল, আমি ওদের “ক্রিসমাস”।

বলার একটা ধরন — আমাকে মেনে নেওয়া হয়েছে।

ধন্যবাদ জানাতে ওদের কিছু টাকা দিতে চাইলাম। ওরা নিল না। ওরা শুধু একটা আলিঙ্গন চাইল। আর কালাত্মীয় ভাষায় কয়েকটা কথা, যাতে আরও কাছে মনে হয়।

সেখানেই বুঝলাম সত্যিকারের উপহারের দাম: যা কেনা যায় না, বেচা যায় না।

গাইডের বিদায়

তিন দিন পরে গাইড এল। তিন নারীর সঙ্গে সে এক ঘণ্টা কথা বলল। আমি বাইরে ছিলাম। ওরা কী বলছিল, বুঝিনি। সেটা আমার ব্যাপার ছিল না। সেটা ওদের ভাষা, ওদের জগৎ, ওদের আইন।

কনটেইনারে, আমি যখন পোশাক খুলছিলাম, গাইড ভেতরে ঢুকল।
কৌতূহলী। সোজাসাপটা। উত্তরে। সে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।
চুমু খেল। তার চামড়া দুধের মতো সাদা। তার চোখ আগস্টের আকাশের
মতো নীল।

সে আমাকে বলল তাকে নিয়ে যেতে। ওই জগৎ থেকে বেরোতে সে যা
খুশি তাই করত।

আমি সম্মান রেখে হাসলাম। আমি পারতাম না। আমার উচিতও ছিল না।

তার কাছে রেখে এলাম শুধু একটা প্রতিশ্রুতি: “কিছু দরকার হলে
আমাকে একটা চিঠি লিখো। আমি তোমাকে সাহায্য করব।” টাকাও সে
ফিরিয়ে দিল। সে ছিল এক সুন্দরী নারী, কিন্তু একা। এমন এক একাকিত্ব,
যা দূর থেকে দেখা যায় না। এমন এক একাকিত্ব, যাকে শীত ক্ষমা করে
না।

ঘরে ফেরা

আমরা নিনোকে আনতে গেলাম। সে আনন্দে আত্মহারা। ফিরতে
চাইছিল না। কিন্তু তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার একটা কথা দেওয়া ছিল।

সে সবাইকে তার তিন দিনের গল্প শোনাল। আমি চুপ করে রইলাম।
পুরুষটির সঙ্গে আমি কিছুই ভাগ করিনি। শুধু কাগজের সঙ্গে।

আর এভাবে, নিনো যখন তার জগতে ফিরছিল, আমি তখনই চলেছি
আরেকটার দিকে। আরেক গন্তব্য। আরেক সাক্ষাৎ।

স্বাগতম।

উপসংহার-কথা

উত্তর তোমাকে কেড়ে নেয় না: তোমাকে বদলে দেয়। আর কখনও

তোমাকে আস্ত ফিরিয়ে দেয় না। পুরুষেরা উত্তর মেরুতে আসে আলো,
নীরবতা, ছবি, স্বপ্নের খোঁজে। নারীরা থেকে যায় টিকে থাকার জন্য।

পুরুষেরা বলে কী দেখেছে। নারীরা চুপ করে থাকে, কী সয়েছে তা নিয়ে।
পুরুষেরা ফিরে যায়। নারীরা থেকে যায়। থেকে যায় শীতে, বরফের ঘরে,
না-শোনা নীরবতায়। থেকে যায় এমন সমাজকে ধরে রাখতে, যা তাদের
সম্মান জানায় না। থেকে যায় শিশু, বৃদ্ধ, অচেনা মানুষকে রক্ষা করতে।
থেকে যায় অদৃশ্য হয়ে।

সেখান থেকে আমি নিয়ে এসেছি শুধু একটা স্মৃতি: এক সুন্দরী,
অবিশ্বাস্য রকম সুন্দরী নারী, কিন্তু একা। রোমান্টিক অর্থে নয়। মানবিক
অর্থে। করুণ অর্থে।

ভাবনা

উত্তর শরীরকে মারে না। মারে উপস্থিতিকে। আর যা থাকে, তা সাদা:
এমন এক জায়গা, যেখানে নারীরা একই সঙ্গে বাঁচে আর হারিয়ে যায়।

এই জন্যই আমি লিখি। কারণ চরম জায়গাগুলো নিজেদের গল্প নিজেরা
বলে না। আর যারা সেগুলোর ভেতর দিয়ে যায়, চুপ করে থাকার
বিলাসিতা তাদের সাজে না।

আমি নই। আমি নই। আমার মাটি আমাকে জন্ম দিয়েছে, আর বাকি
পৃথিবী আমাকে স্বাগত জানায় অতিথি হিসেবে নয়, পরিবারের একজন
হিসেবে।

উত্তরের নিরঙ্কুশ সাদা থেকে আমি নেমে এলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের
নিরঙ্কুশ বিশৃঙ্খলায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

অসম্ভব দায়িত্ব

আঠারো বছর একটা আমেরিকান কোম্পানিতে কাজ করলে তুমি এমন
কিছু পাও, যা পৃথিবীর আর কোনো কোম্পানি দিতে পারে না: এক
কাজের সংস্কৃতি, নিয়মকানুন, একটা স্পষ্ট লক্ষ্য, আর এমন এক
মূল্যবোধের ব্যবস্থা, যা তত্ত্ব নয় — রোজকার অভ্যাস। ওরা তোমাকে

সেগুলো বুঝিয়ে বলে না; তোমার ভেতরে গড়ে দেয়। আর তা করে তোমার অনুমতি না নিয়েই।

আমি তখন নিউ ইয়র্কের অফিসে, যখন আমাকে এমন এক কাজের প্রস্তাব দেওয়া হল, যা কখনও কল্পনাও করিনি। পদোন্নতি নয়। বদলি নয়। একটা পরীক্ষা।

এক গোপন কর্মসূচি, তৈরি হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে মানুষের সম্পর্কের একটা মডেল যাচাই করতে। ওরা ম্যানেজার, মনোবিদ বা প্রশিক্ষক বাছেন। বেছেছিল বাস্তব জগতের এক বিশেষ রকম অভিজ্ঞতা আছে, এমন মানুষ। আর আমার নাম উঠে এল — যদিও আমি আঠারো বছর বিক্রিতে ছিলাম। ওরা পদ দেখছিল না: দেখছিল মন।

পরীক্ষাটা বোঝানো সহজ, শেষ করা ভয়ানক কঠিন:

এক বছরে আমেরিকার 50টি রাজ্য ঘোরা, শহর নিজে বেছে নেওয়া, আর প্রতিটিতে অন্তত এক সপ্তাহ থাকা।

শেষ দু সপ্তাহ হবে বাধ্যতামূলক ছুটি। সব খরচ ওদের। আমাকে শুধু বাঁচতে হবে, দেখতে হবে, বুঝতে হবে, আর প্রতি সোমবার একটা রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এক মানবিক, শুকনো, নিখুঁত বিবরণ।

আমি চুক্তিতে সই করলাম। বাড়িতে জানালাম। ওরা কিছু জিজ্ঞেস করল না। শুধু জানতে চাইল মাসের রসদ এসে পৌঁছেছে কি না। আমি এক বছরের আমেরিকার মুখোমুখি হতে চলেছি। ওরা, বরাবরের মতো, পরের মাসের মুখোমুখি।

নিরাপদে থাকতে, আমার বেতন সরাসরি জমা হত ইতালিতে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। এ ছিল ভদ্রভাবে আমাকে বলার একটা উপায়: “বোকামি কোরো না। যা আছে তাই দিয়ে চলো। দেখি তুমি আসলে কে।”

পনেরো বছর পরে তবেই আমি হাতে পেলাম আমার আসল রিপোর্টগুলো, বিশ্লেষণগুলো, আর আমার সম্পর্কে ওদের জোগাড় করা সব কাগজ। এই বইয়ের জন্ম সেখান থেকে। প্রকাশের অনুমতি পেলাম একটাই শর্তে: যে কোম্পানি এঁটা করিয়েছিল, তার নাম কখনও বলা যাবে না।

তাতে কিছু যায় আসে না। এই গল্প লোগোর গল্প নয়। এ এক মানুষের গল্প, এমন এক দেশে, যাকে নিজে না দেখে বোঝা অসম্ভব।

সবচেয়ে দূরের বিন্দু থেকে শুরু করব?

যুক্তিসংগত পছন্দ ছিল প্রান্ত থেকে শুরু করা, কেন্দ্র থেকে নয়। দুটো সহজ কারণে:

1. আমি পরীক্ষা থেকে সদ্য বেরিয়েছি: মাথা পরিষ্কার, মনোযোগ সর্বোচ্চ।
2. চরম জায়গা থেকে শুরু করলে পথ শুধরে নিয়ে যাত্রাটা পরিচ্ছন্নভাবে শেষ করতে পারব।

বস্টন বা শিকাগো থেকে শুরু করার দরকার ছিল না। শুরু করতে হবে একটা সীমান্ত থেকে। এমন জায়গা থেকে, যা কেবল কাগজে-কলমে আমেরিকা।

বেছে নিলাম জুনো, আলাস্কার রাজধানী। বিচ্ছিন্ন। পৌঁছানো যায় শুধু নৌকা বা প্লেনে। এমন এক শহর, যা কারও নয়। শুরু করার নিখুঁত জায়গা।

সম্পদের সেরা ব্যবহার

রওনা হওয়ার আগে আমি তাই করলাম, যা একজন আমেরিকান সবার আগে সম্মান করে: নিজেকে গুছিয়ে নিলাম পেশাদারের মতো, পর্যটকের মতো নয়।

সবচেয়ে জনপ্রিয় তিনটি এয়ারলাইনকে ফোন করলাম, যাদের দেশের ভেতরে সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্ক। এক ঘণ্টার কম সময়ে 60% ছাড়ে কিনে ফেললাম পঞ্চাশটি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের একটা বুকলেট।

সময়ের সীমা নেই। দিনের সীমা নেই। কোনো বাধা নেই। শর্ত একটাই: এক বছরের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে।

হোটেল চেন, Uber ট্যাক্সি আর গাড়ি ভাড়ার কোম্পানির সঙ্গেও একই কাজ করলাম, তারপর ধাপগুলোর একটা ঠিকঠাক সূচি বানালাম —

পদ্ধতিসহ, কিন্তু সময় ছাড়া।

আমি তৈরি ছিলাম।

এ ছিল আমার প্রথম সত্যিকারের সাফল্য। প্রথম চিহ্ন যে আমি চলাফেরা করতে জানি। আমেরিকা পুরস্কার দেয় তাদের, যারা কাজ করে, তাদের নয়, যারা অপেক্ষা করে।

কোম্পানি যখন লেনদেনটা দেখল, তারা তাই করল, যা আমেরিকান সংস্কৃতি সবসময় করে: নির্ভরযোগ্যতা যাচাই।

আমি কি এক বছরের অবিরাম চলাচল সামলাতে পারব? অপ্রত্যাশিত ঘটনা, দূরত্ব, জরুরি অবস্থা সামলাতে পারব? আমি কি স্বাবলম্বী?

এই জন্য, রওনা হওয়ার আগে, আরেকটা জরুরি খুঁটিনাটি ঠিক করে নিলাম:

নিশ্চিত করলাম যে আমার ক্রেডিট কার্ডে মাসে অন্তত 100,000 ডলারের সীমা আছে।

সেটা খরচ করার জন্য ছিল না। ছিল দেখানোর জন্য যে আমরা তা সামলাতে পারি। আমেরিকানরা এভাবেই ভাবে: তোমার স্বাবলম্বিতা না থাকলে তোমার স্বাধীনতা নেই। আর স্বাধীনতা না থাকলে তোমাকে মূল্যায়ন করা যায় না।

সেই মুহূর্ত থেকে কর্মসূচিটা আর একটা দায়িত্ব রইল না। হয়ে গেল এক অভিযান।

আর এবার সত্যিই যাত্রা

আলাস্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ শুধু ভূগোলের হিসেবে। এ আরেক জগৎ।

এ সেই জায়গা, যেখানে নারীরা চিহ্ন না রেখে হারিয়ে যায়। যেখানে অভিযোগ কখনও গন্তব্যে পৌঁছায় না। যেখানে শহরগুলো এক বুনো মহাদেশের মাঝখানে নিছক সভ্য দ্বীপ।

জুনো ছিল আমার প্রথম পরীক্ষা: এমন এক রাজধানী, যাকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে কোনো রাস্তা জোড়ে না। আমেরিকার এমন এক টুকরো, যাকে আমেরিকা বলে মনে হয় না।

এখানে আমি একটা জিনিস বুঝতে শুরু করলাম: যাত্রাটা ভৌগোলিক হবে না। হবে মানবিক।

ব্লক 1 (খণ্ড I)

আলাবামা – আলাস্কা – অ্যারিজোনা – আরকানসাস – ক্যালিফোর্নিয়া – কলোরাডো – কানেকটিকাট – ডেলাওয়ার – ফ্লোরিডা – জর্জিয়া

ব্লক 2 (খণ্ড II)

হাওয়াই – আইডাহো – ইলিনয় – ইন্ডিয়ানা – আইওয়া – ক্যানসাস – কেন্টাকি – লুইজিয়ানা – মেইন – মেরিল্যান্ড

ব্লক 3 (খণ্ড III)

ম্যাসাচুসেটস – মিশিগান – মিনেসোটা – মিসিসিপি – মিসৌরি – মন্টানা – নেব্রাস্কা – নেভাডা – নিউ হ্যাম্পশায়ার – নিউ জার্সি – নিউ মেক্সিকো

ব্লক 4 (খণ্ড IV)

নিউ ইয়র্ক – ওয়াশিংটন

ব্লক 5 (খণ্ড V)

নর্থ ক্যারোলাইনা – নর্থ ডাকোটা – ওহাইও – ওকলাহোমা – অরেগন – পেনসিলভেনিয়া – রোড আইল্যান্ড – সাউথ ক্যারোলাইনা

ব্লক 6 (খণ্ড VI)

সাউথ ডাকোটা – টেনেসি – টেক্সাস – ইউটা – ভারমন্ট – ভার্জিনিয়া – ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া – উইসকনসিন – ওয়াইওমিং

কেন্টাকি

কেন্টাকি এমন এক রাজ্য যা দুই মাত্রায় বেঁচে থাকে: ওপরের স্তরে কয়লাখনি, হুইস্কি, ঘোড়া আর সবুজ পাহাড়; গভীরে কিন্তু পুরনো দারিদ্র্য, বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়, কঠোর ধর্ম আর বিরল সুযোগ।

এ এমন এক মাটি যা আর গ্রাম্য নয়, কিন্তু এখনও আধুনিকও নয়। ঝুলে আছে। ধীর। ক্লান্ত। আর যখন কোনো মাটি ঝুলে থাকে, তাকে ধরে রাখে নারীরাই।

কেন্টাকিতে একজন নারী কোনো ঘটনার কারণে হারিয়ে যায় না। হারিয়ে যায় এক সামাজিক উত্তরাধিকারের কারণে, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম তার কাছে আত্মত্যাগ দাবি করেছে। পরিবার, সন্তান, অনিশ্চিত কাজ, গির্জা, প্রতিবেশী, অন্যের সমস্যা: সবকিছু তাদের কাঁধে। তার অনুপস্থিতি শব্দ নয়। ভার।

প্রাক্তন খনি-এলাকার নারী – 41 বছর

বয়স

কয়লা কেন্টাকিকে গড়েছে আর ধ্বংসও করেছে। খনি বন্ধ হয়, পুরুষেরা কাজ হারায়, রাসায়নিকের ওপর নির্ভরতা বাড়ে, দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ে।

এখানকার নারীরা সেই ধ্বংসের পরের ভার বইছে। – কাজহারা স্বামী – হতাশার মধ্যে বড় হওয়া সন্তান – অসম্ভব কম মজুরি – বন্ধু আর আত্মীয়দের মধ্যে ওভারডোজ – বিরক্তিতে ফেটে পড়া সম্প্রদায়।

তারা কাজ করে দোকানে, স্কুলে, পরিষেবা সংস্থায়, সহায়তাকর্মী হিসেবে। ভেঙে পড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা আর করে না, তার সবকিছু তারা করে।

তার অনুপস্থিতি সামাজিক: সে নারী না হলে রাজ্যটা ভেঙে পড়ত। কিন্তু কেউ তাকে স্বীকার করে না।

ডার্বি আর ঘোড়া-প্রজননের নারী - 36 বছর

কেন্টাকি তার ঘোড়া আর ডার্বির জন্য বিখ্যাত। সেই মার্জিত ছবির পেছনে আছে নারীদের এক বাহিনী, যারা আস্তাবল সাফ করে, পশু সামলায়, ভোরের শিফটে কাজ করে, আর হাস্যকর মজুরিতে খাটে।

জৌলুস সামনে। ঘাম পেছনে।

তার অনুপস্থিতি অর্থনৈতিক: তাকে ছাড়া শিল্পটা চলে না, অথচ সে থেকে যায় এমন এক যন্ত্রাংশ, যাকে জনসাধারণ আর রাজনীতিকরা উপেক্ষা করে।

ধর্মে বন্দি নারী - 48 বছর।

কেন্টাকির অনেক কাউন্টিতে গির্জার ক্ষমতা রাজ্যের চেয়েও বেশি।

একজন নারীকে হতে হবে: - মা - স্ত্রী - নৈতিক আদর্শ - সম্মানজনক উপস্থিতি - সম্প্রদায়ের প্রতি অনুগত।

সে নিজের ভূমিকা থেকে বেরোতে পারে না। নিজেকে নতুন করে গড়তে পারে না। সন্দেহ বা দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারে না।

তার অনুপস্থিতি সাংস্কৃতিক: সে নিজের নয়। সে জায়গাটার ধর্মীয় আখ্যানের।

ন্যূনতম মজুরির কাজের নারী - 29 বছর

কেন্টাকি বেঁচে থাকে কম মজুরির কাজে। আর সেই কাজগুলো সবই নারীদের।

ক্যাশিয়ার, ওয়েস্ট্রেস, মেঝে সাফাইকর্মী, নার্সিং হোমের কর্মী, স্কুলের সহকারী। অনিশ্চিত শিফট, দামি পেট্রোল, মানুষ করার মতো সন্তান আর শূন্য ভবিষ্যতে ক্ষয়ে যাওয়া জীবন।

তার অনুপস্থিতি অর্থনৈতিক আর মানসিক: সে কোনো পথ দেখে না, আর কেউ তাকে পথ দেখায়ও না।

উপসংহার - কেন্টাকি

কেন্টাকি ঐতিহ্য, দারিদ্র্য, ধর্ম আর কষ্টের এক মোজাইক। নারীরা তার মেরুদণ্ড। আর ঠিক এই কারণেই তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।

এখানে অনুপস্থিতি এক সমষ্টিগত অভ্যাস। এক জীবনযাপনের ধরন। এক ভুল স্বাভাবিকতা, যাকে কেউ কখনও প্রশ্ন করে না।

ভাবনা - কেন্টাকি

প্রতিটি রাজ্য অনুপস্থিতির এক আলাদা মুখ দেখায়। কেন্টাকি দেখায় সেই মুখ, যা জন্মেছে অর্থনৈতিক পতন আর অতীত আঁকড়ে থাকা ঐতিহ্য থেকে।

এখানে নারী ধরে রাখে সবকিছু, যা পুরুষেরা হারিয়েছে, যা ধর্ম চাপিয়ে দেয়, যা দারিদ্র্য স্থায়ী করে।

সে-ই মজবুত কড়া, অথচ তার সঙ্গে আচরণ করা হয় দুর্বল কড়ার মতো।

আর ঠিক এই কারণেই রাজ্যটা এই খণ্ডে দরকার: দেখানোর জন্য, যখন একটা সমাজ সবকিছু নারীদের কাঁধে চাপিয়ে দেয় আর তারপর এমন ভাব করে যেন সেটাই স্বাভাবিক, তখন কী ঘটে।

লুইজিয়ানা

লুইজিয়ানা তীব্র বৈপরীত্যের এক রাজ্য। সে সংস্কৃতি, সংগীত, ইতিহাস, রান্না, আধ্যাত্মিকতা আর পরিচয়। কিন্তু সে দারিদ্র্য, অস্থিরতা, নেশা, জাতিগত বৈষম্য, বিধ্বংসী হারিকেন, বিশৃঙ্খল রাজনীতি আর এক ভঙ্গুর সামাজিক ব্যবস্থাও।

এ এমন এক জায়গা যেখানে সৌন্দর্য আর কদর্যতা পাশাপাশি থাকে, ভারসাম্যহীনভাবে। এখানে সবকিছুর দুটো দিক: নিউ অরলিন্স উৎসব আর আঘাত, ব্যাটন রুজ রাজনীতি আর অবক্ষয়, আর গ্রামের প্যারিশগুলো সম্প্রদায় আর বিচ্ছিন্নতা।

লুইজিয়ানার নারী হঠাৎ করে হারিয়ে যায় না। হারিয়ে যায় কারণ এক অস্থির মাটিতে সে-ই একমাত্র স্থির মানুষ। আর এই স্থিরতাই তাকে ক্ষয় করে।

তার অনুপস্থিতি তিনটি ভারী কারণের ফল: – গভীরে শিকড় গাড়া দারিদ্র্য

– বারবার ফিরে আসা পরিবেশগত বিপর্যয়

– কঠোর সাংস্কৃতিক পিতৃতন্ত্র।

এখানে নারীরা চালায় পরিবার, পাড়া, গোটা সম্প্রদায়। আর যখন বাকি সবাই সামনে আসে, সে মিলিয়ে যায়।

নিউ অরলিন্সের নারী – 35 বছর

নিউ অরলিন্স মানে সংগীত, উৎসব, বিশৃঙ্খলা আর ইতিহাস। কিন্তু সে দেশের সবচেয়ে জটিল আর কঠিন শহরগুলোর একটাও।

এখানে যে নারী কাজ করে, সে একসঙ্গে তিনটি ফ্রন্টে বাঁচে: – শিকারি পর্যটন – শহুরে হিংসা – অস্থির অর্থনীতি

কাজ করে: – বারে – হোটেলে – রেস্টোরাঁয় – পর্যটন ট্যুরে – সরকারি পরিষেবায় – লাইভ মিউজিকে – নাইটলাইফে

বাধ্যতামূলক হাসি। কম মজুরি। চড়া ভাড়া। ঝামেলার খদ্দের। ক্লান্তিকর সময়।

তার অনুপস্থিতি নৈতিক: শহরটা তার শক্তি ব্যবহার করে আর তাকে ফেরত দেয় নিঃশেষ করে।

সবাই নিউ অরলিন্সের “জাদু” চায়। যারা সেটা তৈরি করে, তাদের কেউ টাকা দেয় না।

গরিব প্যারিশগুলোর আফ্রিকান আমেরিকান নারী –

42 বছর নিউ অরলিন্সের বাইরে আছে গ্রামীণ আর দরিদ্র লুইজিয়ানা। ছোট বাড়ি, দুর্বল স্কুল, ন্যূনতম পরিষেবা আর হাস্যকর মজুরি।

এখানকার আফ্রিকান আমেরিকান নারী একসঙ্গে তিনটি ভূমিকা পালন করে: – কর্মী – মা – সম্প্রদায়ের সামাজিক স্তম্ভ।

যেখানে পারে সেখানেই কাজ করে: – নার্সিং হোমে – মুদির দোকানে – ফাস্ট-ফুডের রান্নাঘরে – সাফাইয়ে – অনানুষ্ঠানিক সেবায়।

তাকে ছাড়া সম্প্রদায় চলে না। তবু সে বাঁচে কম মজুরি, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, সামান্য স্বাস্থ্যসেবা আর গার্হস্থ্য হিংসার নিত্য উপস্থিতির মধ্যে।

তার অনুপস্থিতি ঐতিহাসিক: এটা নেমে এসেছে সেই একই কাঠামো থেকে, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাকে সবসময় সমাজের সিঁড়ির সবচেয়ে নিচে রেখেছে।

হারিকেন পেরিয়ে বাঁচা নারী – 39 বছর

বয়স

লুইজিয়ানায় “স্থির” জীবন বলে কিছু নেই। হারিকেন সবকিছু বদলে দেয়: ধ্বংস হওয়া বাড়ি, হারানো কাজ, ছিন্ন পরিবার, হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি।

নারীই সে, যে: – বাচ্চাদের সরিয়ে নিয়ে যায় – কাগজপত্র রক্ষা করে – জলে ডোবা বাড়ি সাফ করে – শূন্য থেকে শুরু করে – দেরিতে বা কখনওই টাকা না দেওয়া বিমা সামলায় – ভেতরে ভেঙে পড়তে পড়তেও পরিবারকে শান্ত রাখে।

পুরুষদের কাছে পুনর্গঠন শারীরিক। নারীদের কাছে মানসিক। বছরের পর বছর।

তার অনুপস্থিতি পরিবেশগত: প্রতিটি ঝড় তার শক্তির এক টুকরো কেড়ে নেয়, যতক্ষণ না প্রায় কিছুই বাকি থাকে। এর জন্য কেউ তাকে ক্ষতিপূরণ দেয় না।

ভারী ঐতিহ্যের নারী – 51 বছর

লুইজিয়ানা বেঁচে থাকে শক্ত, গভীরে শিকড় গাড়া, প্রায় পবিত্র ঐতিহ্যে।

একজন নারীকে হতে হবে: – নিখুঁত মা – ঘরের কেন্দ্র – বড় পরিবারের
ভিত্তিপ্রস্তর – গির্জায় উপস্থিতি – বয়স্কদের সেবিকা – ছোটদের
পথপ্রদর্শক – সবকিছুর ভার বওয়া কাঠামো।

এ এক প্রাচীন ভূমিকা, কখনও হালনাগাদ হয়নি।

সে পরিবারের অনুরোধ ফেরাতে পারে না। মুখের ওপর জবাব দিতে
পারে না। “না” বলতে পারে না। অপরাধবোধ ছাড়া নিজের কথা ভাবতে
পারে না।

তার অনুপস্থিতি সাংস্কৃতিক আর আবেগগত: সবাইকে ধরে রাখতে সে
এত ব্যস্ত যে নিজের কাছ থেকেই হারিয়ে যায়।

উপসংহার – লুইজিয়ানা

লুইজিয়ানা সৌন্দর্য আর না-শুকানো ক্ষতের এক মিশেল। আর এই
রোজকার বিশৃঙ্খলার মধ্যে নারীরা সবকিছু একসঙ্গে ধরে রাখে: পরিবার,
কাজ, সম্প্রদায়, ঐতিহ্য, আবেগের টিকে থাকা।

তাদের অনুপস্থিতি এক প্যারাডক্স: তারা যত বেশি করে, তত কম দেখা
যায়।

লুইজিয়ানা নারীদের একটিমাত্র শক্তি দিয়ে মুছে দেয় না। মুছে দেয়
হাজারটা ছোট, রোজকার শক্তি দিয়ে: দারিদ্র্য, হারিকেন, পর্যটন,
জাতিগত ইতিহাস, পারিবারিক ভূমিকা, সহায়তার অভাব।

এ এক ধীর, গভীর, নীরব মুছে ফেলা।

ভাবনা – লুইজিয়ানা

প্রতিটি রাজ্য অনুপস্থিতির এক আলাদা রূপ দেখায়। লুইজিয়ানা দেখায়
সেই রূপ, যার কারণ: – প্রাকৃতিক বিপর্যয় – সামাজিক বিপর্যয় –
পারিবারিক বিপর্যয়।

এ সেই রাজ্য, যেখানে নারী সবার জন্য টিকে থাকে, কিন্তু তার জন্য
কেউ টিকে থাকে না।

এ সেই রাজ্য, যেখানে আঘাত হয়ে ওঠে রুটিন আর রুটিন হয়ে ওঠে পরিচয়।

লুইজিয়ানা দেখায়, নারীর অনুপস্থিতি শুধু দারিদ্র্য বা অধিকারের অভাব নয়। এ এমন এক গভীর ক্লান্তিও, যা আর কেউ লক্ষ্যই করে না।

আর সেই কারণেই এই অধ্যায় জরুরি: মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে নিউ অরলিন্সের প্রতিটি পোস্টকার্ডের পেছনে আছে এক নারী, যে এমন কিছু ধরে রেখেছে যা পৃথিবী দেখতে পায় না।

মেইন

মেইন আমেরিকার সবচেয়ে সুন্দর আর সবচেয়ে রুক্ষ রাজ্যগুলোর একটা। অন্তহীন অরণ্য, ঠান্ডা উপকূল, বাতিঘর, জেলেপাড়া আর বিশাল নীরবতা। যারা বেড়াতে আসে, শুধু তাদের কাছেই এ রোমান্টিক মাটি। যারা এখানে থাকে, তাদের কাছে এ নিখাদ বিচ্ছিন্নতা।

জনবসতি পাতলা, দূরত্ব লম্বা, শীত চলে মাসের পর মাস, সুযোগ অল্প। মেইন তোমাকে আক্রমণ করে না: তোমাকে ক্ষয় করে।

এখানে নারীরা হারিয়ে যায় তিনটি কারণে: – ভৌগোলিক একাকিত্ব – অস্থির মৌসুমি কাজ – বদলের দম বন্ধ করে দেওয়া ছোট সম্প্রদায়। এ এমন এক রাজ্য, যেখানে প্রকৃতি শাসন করে আর মানুষ মানিয়ে নেয়। সবসময়। বড্ড বেশি।

মেইনের নারী ধাক্কায়ে ভেঙে পড়ে না। ভেঙে পড়ে পুনরাবৃত্তিতে।

জেলেপাড়ার নারী – 39 বছর

মেইনের উপকূল বাঁচে মাছ ধরায়: লবস্টার, কড, ছোট মৌসুম আর কঠিন খাটুনি।

এখানে নারী সামলায় সেই সবকিছু, যা নৌকা সামলায় না: – সমন্বয় – সারাই করার জাল – বিক্রি – সংসারের হিসাব – পরিবার – ঘর – আচমকা বিপদ।

দূর থেকে সমুদ্র সুন্দর। কাছ থেকে সে এক নির্দয় প্রভু।

তার অনুপস্থিতি অর্থনৈতিক আর শারীরিক দুই-ই: সে বাঁচে এমন এক খাতে, যেখানে রোজগার নির্ভর করে আবহাওয়া, মৌসুম আর ভাগ্যের ওপর। আর মৌসুম শেষ হলে নিরাপত্তাও শেষ।

দীর্ঘ শীতে বাঁচা নারী – 52 বছর

বয়স

শীতের মেইন এক দেয়াল: বরফ, তুষারপাত, অন্ধকার, অন্তহীন নীরবতা।

ভেতরের অঞ্চলে — মিলিনকেট, গ্রিনভিল, লেক ডিস্ট্রিক্ট — নারীদের মুখোমুখি হতে হয়: – সত্যিকারের সামাজিক যোগাযোগ ছাড়া কাটানো মাস– বিপজ্জনক রাস্তা– বিচ্ছিন্ন বাড়ি– সামান্য স্বাস্থ্যসেবা– ব্যাপক মৌসুমি বিষণ্ণতা– জরুরি পরিষেবা থেকে দূরত্ব

সে অসুস্থ হলে অপেক্ষা করে। ডাক্তার দরকার হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি চালায়। মনের দিক থেকে ভেঙে পড়লে কেউ তাকে দেখে না। তার অনুপস্থিতি ভৌগোলিক: সে হারিয়ে যায় কারণ সে সবকিছু থেকে দূরে।

মৌসুমি কাজের নারী – 28 বছর

গ্রীষ্মে মেইন ফেটে পড়ে: পর্যটন, B&B, রেস্টোরাঁ, ক্রুজ।

এখানে নারী অক্লান্ত কাজ করে: – পরিবেশন – সাফাই – রান্না – অতিথি-অভ্যর্থনা – ব্যবস্থাপনা – গোছগাছ।

এ কঠিন, কম মজুরির, অস্থির কাজ। তিন মাস চলে, তারপর কিছুই না।

প্রবল ব্যস্ত সময় থেকে সে চলে যায় ফাঁকা সপ্তাহে। দ্রুত আসা টাকা থেকে টিকে থাকার মাসে।

তার অনুপস্থিতি অর্থনৈতিক: সে সবসময় দুই মৌসুমের মাঝে বাঁচে, কিন্তু কোনোটারই নয়।

ছোট সম্প্রদায়ের নারী - 46 বছর

মেইনের ছোট শহরগুলো বন্ধ সম্প্রদায়: সবাই সবার সম্পর্কে সব জানে, আর কেউ কখনও সত্যিই বদলায় না।

এখানে নারীকে হতে হবে সোজাসাপটা: - মা - স্থির কর্মী - নির্ভরযোগ্য উপস্থিতি - স্থানীয় নিয়ম অনুযায়ী "ভালো মানুষ"।

সে নিজেকে নতুন করে গড়তে পারে না। সহজে কাজ বদলাতে পারে না। বিচারের মুখে না পড়ে সম্প্রদায় ছেড়ে যেতে পারে না।

তার অনুপস্থিতি সাংস্কৃতিক: সে নিজের চেয়ে বেশি এই অঞ্চলের। সে বন্দি দুষ্টতার নয়, অভ্যাসের।

উপসংহার - মেইন

মেইন এমন এক রাজ্য, যা তোমাকে নীরবে দেখে। আর নীরবতা যখন অতিরিক্ত হয়, তখন সেটা ভার হয়ে ওঠে।

এখানে নারীরা হারিয়ে যায় দূরত্বে, মৌসুমে, বারবার একই ভূমিকায়, অনিশ্চিত কাজে, বন্ধ গ্রামে, দীর্ঘ শীতে।

অনুপস্থিতি চোখে পড়ে না। সে থাকে চামড়ার নিচে। সে রোজকার ঘটনা।

মেইন আঘাত করে না। তোমাকে ছেড়ে দেয়।

ভাবনা - মেইন

প্রতিটি রাজ্য এক ধরনের অনুপস্থিতি দেখায়। মেইন দেখায় সেটি, যার জন্ম ভূগোল থেকে:

এলাকা যত সুন্দর, সেখানে যারা থাকে তাদের জন্য জীবন তত কঠিন।

এখানে নারী সংঘাতে মুছে যায় না, মুছে যায় নীরবতায়। পুনরাবৃত্তিতে। দূরত্বে। কখনও না-কাটা ঠান্ডায়। ছোট হয়ে আসা জীবনে।

মেইন একটা কথাই শেখায়: নারীর অনুপস্থিতিও একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য হতে পারে। একটা মানচিত্র। কখনও শেষ না-হওয়া এক ঋতু।

আর সেই কারণেই এই অধ্যায়টা দরকারি: কারণ আমেরিকা শুধু হিংসা বা বিশৃঙ্খলা নয়। আমেরিকা এক গ্রাস-করা নীরবতাও।

মেরিল্যান্ড

মেরিল্যান্ড এক প্রতারক রাজ্য। ছোট, আটলান্টিকের দিকে মুখ করা, ওয়াশিংটনের কাছে। ওপরে মার্জিত, ভেতরে জটিল।

এটা দু ভাগে ভাঙা এক এলাকা: – ধনী, শিক্ষিত, সুরক্ষিত, গোছানো শহরতলি – কঠিন, গরিব শহর, অপরাধ আর অবহেলার দাগ-লাগা।

এটা আমেরিকার সবচেয়ে বেশি গড় আয়ের রাজ্যগুলোর একটি, আবার একই সঙ্গে সবচেয়ে স্পষ্ট বৈষম্যের রাজ্যগুলোরও একটি।

এখানে নারীরা কোনো একটা কারণে হারিয়ে যায় না। তারা হারিয়ে যায় এত বেশি জগতের জন্য, যেগুলোর সঙ্গে তাদের মানিয়ে নিতে হয়: মহানগর, শহরতলি, রাজনীতি, স্বাস্থ্যসেবা, শহুরে দারিদ্র্য, জাতিগত পরিচয়।

মেরিল্যান্ডে নারীর অনুপস্থিতি বহুমুখী।

সেটা বদলায় জিপ কোড অনুযায়ী।

বাল্টিমোরের নারী – 34 বছর

বাল্টিমোর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জটিল শহরগুলোর একটি: শিকড় গাড়া দারিদ্র্য, উঁচু অপরাধ, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, ভারে নুয়ে পড়া পরিষেবা, ঝুঁকিতে থাকা স্কুল।

এখানে নারীরা সবকিছু ধরে রাখে: – সন্তান – অনিশ্চিত কাজ – বিপজ্জনক পাড়া – নাগালের বাইরে জীবনযাত্রার খরচ – ধীর যাতায়াত – সত্যিকারের সুরক্ষার অভাব।

যেখানে পারে সেখানেই কাজ করে: সুপারমার্কেট, ক্লিনিক, সহায়তা কেন্দ্র, ফাস্ট-ফুড রেস্টোরাঁ, বৃদ্ধাশ্রম, সাফাই। তার অনুপস্থিতি শহুরে:

শহর “পুনর্নির্মাণের” কথা বলে, কিন্তু কখনও তার জীবন থেকে শুরু করে না।

ব্যবস্থার চোখে সে দৃশ্যমান কেবল তখনই, যখন সে শ্রমশক্তি হিসেবে কাজে লাগে। তার অধিকার স্বীকৃতি পাওয়ার সময় এলে সে উধাও হয়ে যায়।

ধনী শহরতলির নারী – 42 বছর

মেরিল্যান্ডের ধনী অংশটা নিখুঁত: সিনেমার মতো বাড়ি, উঁচু আয়, অভিজাত স্কুল, উচ্চাকাঙ্ক্ষী কেরিয়ার, সুগঠিত পরিবার।

এখানে নারী হারিয়ে যায় অন্য এক কারণে: নিখুঁত হওয়ার চাপ।

এটা প্রতিযোগিতার পরিবেশ, যেখানে নারীর ভূমিকা হতে হবে নিখুঁত: – পরিবারের পুরো দায়িত্ব – উঁচু সামাজিক ভাবমূর্তি – নিখুঁত সন্তান – বাধ্যতামূলক স্বৈচ্ছাসেবা – পাশাপাশি চাকরি বা কেরিয়ার, যা কখনও সঙ্গীকে “ছাপিয়ে” যেতে পারবে না।

সে এমন এক পরিবেশে বাঁচে, যা চায় সে সবসময় হাজির থাকুক, কখনও হাল না ছাড়ুক, কখনও ক্লান্তি না দেখাক।

তার অনুপস্থিতি পরিচয়ের: সমাজ তাকে একটা ভূমিকা হিসেবে দেখে, মানুষ হিসেবে নয়।

সেন্ট্রালের আফ্রিকান আমেরিকান নারী

করিডর – 45 বছর মেরিল্যান্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় আর প্রভাবশালী আফ্রিকান আমেরিকান সম্প্রদায়গুলোর একটি আছে।

এখানে নারীরা সমাজের চালিকাশক্তি: – তারা স্বাস্থ্যসেবায় কাজ করে – তারা স্কুলে কাজ করে – তারা অফিস আর সরকারি প্রশাসন চালায় – তারা বড় বড় পরিবার একসঙ্গে ধরে রাখে – তারা গোটা সম্প্রদায়কে টিকিয়ে রাখে। কিন্তু সে বাঁচে দ্বিগুণ বোঝা নিয়ে: জাতির আর লিঙ্গের।

সে সব করে। সব ধরে রাখে। সব জায়গায় থাকে। কিন্তু তার কথা খুব কমই শোনা হয়।

তার অনুপস্থিতি রাজনৈতিক: সে রাজ্যকে টিকিয়ে রাখে, অথচ যে টেবিলে সিদ্ধান্ত হয় সেখানে তার আসন নেই।

যে নারী স্বাস্থ্যসেবায় কাজ করে – 37 বছর

ওয়াশিংটনের কাছে থাকা আর বড় বড় আঞ্চলিক হাসপাতালের জন্য মেরিল্যান্ড সবচেয়ে বেশি নারী স্বাস্থ্যকর্মীর রাজ্যগুলোর একটি।

এখানে নারীরা এমন এক ব্যবস্থার ভেতরে বাঁচে, যার দাবি কখনও থামে না: – শেষ-না-হওয়া শিফট – উপচে পড়া ওয়ার্ড – বারবার জরুরি অবস্থা – অত্যন্ত বেশি দায়িত্ব – সামান্য মানসিক সুরক্ষা – এমন বেতন, যা মানসিক আঘাতের ক্ষতিপূরণ দেয় না।

সে-ই সবার চিকিৎসা করে: বয়স্কদের, শিশুদের, দীর্ঘ রোগে ভোগা মানুষদের, শহরের জরুরি অবস্থার, পরিবেশ-বিপর্যয়ের।

তার অনুপস্থিতি কাজের: সে অপরিহার্য, কিন্তু স্বাস্থ্য নিয়ে সিদ্ধান্তে তার কণ্ঠের ওজন আশ্চর্য রকম কম।

উপসংহার – মেরিল্যান্ড

মেরিল্যান্ড তীব্র বৈপরীত্যের ওপর গড়া এক রাজ্য: চরম সম্পদ আর চরম দারিদ্র্য, ক্ষমতাধর রাজনীতি আর পরিত্যক্ত পাড়া, উজ্জ্বল কেরিয়ার আর নগণ্য কাজ। এখানে নারীরা এই সব বৈপরীত্য একসঙ্গে বাঁচে। মেরিল্যান্ডের প্রতিটি এলাকায় মুছে ফেলার আলাদা রূপ: শহুরে, সামাজিক, পরিচয়ের, জাতিগত আর স্বাস্থ্যের।

তাদের অনুপস্থিতি এক সমষ্টিগত ফল: রাজ্যটা চলে, কারণ তারা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর ঠিক সেই কারণেই তাদের দেখা যায় না।

ভাবনা – মেরিল্যান্ড

প্রতিটি রাজ্য নারীর অনুপস্থিতির এক সূক্ষ্ম বিবরণ দেয়। মেরিল্যান্ড দেয় সবচেয়ে জটিলটা: নারীরা সমাজের প্রতিটি স্তরে আছে, অথচ ঠিক সেখানেই উপেক্ষিত, যেখানে ব্যবস্থাটা রূপ নেয়।

এখানে নারী: – ধনী শহরতলির মেরুদণ্ড– কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের
চালিকাশক্তি– স্বাস্থ্যসেবার জোগানদার– গরিব পাড়ার টিকে থাকা।

তবু তাকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকার করা হয় না, কৌশলের
কেন্দ্রে রাখা হয় না, সুরক্ষা দেওয়া হয় না।

মেরিল্যান্ডে অনুপস্থিতি দারিদ্র্য বা একাকিত্ব নয়। এটা অসামঞ্জস্য:
নারীরা যা দেয়, রাজ্য ফিরিয়ে দেয় তার চেয়ে কম।

আর সেই কারণেই এই খণ্ডে তার জায়গা।

ম্যাসাচুসেটস

ম্যাসাচুসেটস আমেরিকার সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত রাজ্যগুলোর একটি।
অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বমানের হাসপাতাল, গবেষণা কেন্দ্র, প্রযুক্তি
আর উদ্ভাবন। বাইরে থেকে মনে হয় দেশের সবচেয়ে উন্নত আর
“ঠিকঠাক” জায়গাগুলোর একটি: উচ্চশিক্ষা, উঁচু আয়, আধুনিক নীতি,
পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা।

কিন্তু সত্যিটা আরও জটিল।

ম্যাসাচুসেটস দুই গতির এক এলাকা: – যারা জ্ঞানের বৃত্তের অংশ – যারা
সেই দরজার বাইরে থেকে যায়।

এটা এমন এক রাজ্য, যা প্রগতির কথা বলে, কিন্তু বাঁচে বিপুল সাংস্কৃতিক
চাপের মধ্যে। আর সেই চাপ ধীরে ধীরে নারীর উপস্থিতিকে পিষে ফেলে।

এখানে নারীরা হারিয়ে যায় না কিছুই অভাবে। তারা হারিয়ে যায় প্রত্যাশার
আধিক্যে: কেরিয়ার, পরিবার, উঁচু মানদণ্ড, সবসময় সমান কৃতিত্ব,
নিখুঁত সামাজিক আদর্শ।

ম্যাসাচুসেটসে নারীর অনুপস্থিতি আধুনিক, শিক্ষিত, পরিশীলিত—আর
বিধ্বংসী।

অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী - 33 বছর

ম্যাসাচুসেটস পৃথিবীর শিক্ষাজগতের হৃৎপিণ্ড। জ্ঞানের ভবিষ্যৎ ঠিক হয় ওই ক্যাম্পাসগুলোর ভেতরে।

নারী গবেষক ঢোকে অসাধারণ যোগ্যতা নিয়ে, কিন্তু মুখোমুখি হয় এমন এক ব্যবস্থার, যা দাবি করে:

– থামাথামি ছাড়া প্রকাশ করো – সুরক্ষিত সহকর্মীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করো – সম্মেলন, সেমিনার, বড় বড় অনুষ্ঠান করো – সবসময় ঝকঝকে ভাবমূর্তি বজায় রাখো – বছরের পর বছর নিজের ব্যক্তিগত জীবন ছেড়ে দাও

পরিবেশটা প্রগতিশীল মনে হয়, কিন্তু ক্ষমতার পদগুলো পুরুষেরই থেকে যায়। যারা গবেষণা করে তারা শ্বাস নেয় উৎকর্ষের বাতাসে... আর ক্ষয়ের।

তার অনুপস্থিতি প্রাতিষ্ঠানিক: সে জ্ঞান তৈরি করে, কিন্তু খুব কমই নেতৃত্ব দেয়।

সাফাই আর খাবার পরিষেবার অভিবাসী নারী - 29 বছর

ছবির মতো নিখুঁত ক্যাম্পাসগুলোর বাইরে ম্যাসাচুসেটস চলে অভিবাসী শ্রমে: লাতিনা, হাইতীয়, ব্রাজিলীয়, কেপ ভাদেঁর, আফ্রিকান নারীরা।

তরাই: – অভিজাতদের অফিস সাফ করে – বিশ্ববিদ্যালয়ের রেস্টোরাঁয় রান্না করে – হোটেলে শিফটে কাজ করে – বস্টনের রেস্টোরাঁর রান্নাঘর চালায় – বয়স্কদের দেখাশোনা করে – অন্যের সন্তানদের যত্ন নেয়।

কঠিন জীবন, সামান্য রোজগার, আকাশছোঁয়া ভাড়া।

তার অনুপস্থিতি অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক: সে আমেরিকার সবচেয়ে শিক্ষিত শহরটাকে ভাসিয়ে রাখে, অথচ কেউ তাকে স্বীকার করে না।

ক্লিনিক আর হাসপাতালের নারী - 41 বছর

ম্যাসাচুসেটস উন্নত স্বাস্থ্যসেবার কেন্দ্র। বড় বড় নামের পেছনে আছে হাজার হাজার নারী: নার্স, টেকনিশিয়ান, ওয়ার্ডকর্মী, সহকারী আর

সহায়ক কর্মী।

অসম্ভব শিফট। অবিরাম চাপ। বিপুল দায়িত্ব। কঠিন রোগী। অত্যন্ত বেশি জীবনযাত্রার খরচ। সামান্য বিশ্রাম।

তার অনুপস্থিতি কাজের: সে আমেরিকার সেরা স্বাস্থ্যসেবার ইঞ্জিন, কিন্তু ব্যবস্থাটা তাকে মানুষ হিসেবে দেখে না: শুধু একটা কাজ হিসেবে দেখে।

কঠিন পাড়াগুলোর নারী - 35 বছর

সচ্ছল ক্যাম্পাস আর শহরতলির বাইরে ম্যাসাচুসেটসে আছে সত্যিকারের, কঠোর দারিদ্র্য, যা গণমাধ্যমের চোখে অদৃশ্য।

এখানে যে নারী থাকে, তাকে সামলাতে হয়: – সাধের বাইরে ভাড়া – দুর্বল স্কুল – ছড়িয়ে থাকা হিংসা – অপরিষেবা – অনিশ্চিত যাতায়াত – কম মজুরির কাজ – কাঠামোগত জাতিগত বৈষম্য।

সে রোজকার এক টিকে থাকা মানুষ।

তার অনুপস্থিতি শহুরে: সে ম্যাসাচুসেটসের “নিখুঁত” গল্পে খাপ খায় না, তাই ব্যবস্থা তাকে উপেক্ষা করে।

উপসংহার – ম্যাসাচুসেটস

এই রাজ্য এক স্পষ্ট বৈপরীত্য: সে যত শিক্ষিত, তত বেশি আশা করে নারীরা সবকিছু সামলাবে।

এখানে অনুপস্থিতি অজ্ঞতা নয়। এটা অতি-উৎকর্ষ। এই বিশ্বাস যে, এক উন্নত এলাকায় “সব ঠিক হয়ে যাবে।”

সব ঠিক নেই।

নারীরা বিপুল আর অদৃশ্য বোঝা বয়: শিক্ষার, স্বাস্থ্যের, পরিবারের, অর্থের।

ম্যাসাচুসেটস চলে, কারণ তারা কাজ করে। আর ঠিক সেই কারণেই তারা হারিয়ে যায়।

ভাবনা – ম্যাসাচুসেটস

প্রতিটি রাজ্য আলাদা এক ক্ষত দেখায়। ম্যাসাচুসেটস দেখায় সেটি, যা লুকিয়ে আছে তার সংস্কৃতির নিচে।

এখানে নারীরা মুছে যায় না সুযোগের অভাবে। তারা মুছে যায়, কারণ সুযোগ অনেক বেশি, আর সেগুলোর মুখোমুখি হওয়ার সময় কেউ তাদের সুরক্ষা দেয় না।

এটা আধুনিক এক মুছে ফেলা: হিংস্র নয়, কোলাহলময় নয়, চোখে পড়ার মতো নয়। কিন্তু সম্পূর্ণ।

আর এই কারণেই ম্যাসাচুসেটস এক দরকারি অধ্যায়: মনে করিয়ে দিতে যে প্রগতি যথেষ্ট নয়, যদি তা সত্যিই মুক্তি না দেয় তাদের, যারা তাকে ধরে রাখে।

মিশিগান

মিশিগান শিল্পের আমেরিকার কঙ্কাল। যে রাজ্য গাড়ি সৃষ্টি করেছিল, যে গড়েছিল আমেরিকান শ্রমিক শ্রেণির ধারণাটাই—আর যে দেখেছে সব ভেঙে পড়তে। বন্ধ কারখানা, খালি হয়ে যাওয়া শহর, পরিত্যক্ত পাড়া, দূষিত জল, নেশা, পুরোনো হয়ে আসা পরিকাঠামো, কমে যাওয়া মজুরি।

এটা এমন এক রাজ্য, যা দেখেছে উত্থান, পতন আর ঘুরে দাঁড়ানো। আর এই সবকিছুর মধ্যে নারীরা সহ্য করেছে সেই ভার, যা পুরুষেরা আর বইতে পারেনি।

মিশিগান নারীদের এক ঝটকায় মুছে দেয় না। দিনের পর দিন তাদের খেয়ে ফেলে, তিনটি শক্তি দিয়ে: – ভেঙে পড়া শিল্প – খালি হয়ে যাওয়া শহর – সবকিছু বিষিয়ে দেওয়া পরিবেশের সমস্যা। এখানে নারীর অনুপস্থিতি এক ভাঙা অর্থনীতির ফল, যা প্রায় কিছুই না দিয়ে দাবি করেই চলে।

ডেট্রয়েটের নারী – 38 বছর

ডেট্রয়েট শিল্প-পতনের বিশ্বজোড়া প্রতীক। খালি পাড়া, পরিত্যক্ত বাড়ি, দুর্বল পরিষেবা, অর্থাভাবে ঝুঁকতে থাকা স্কুল আর পুরোনো দারিদ্র্য।

এখানে নারীরা বাঁচে এসবের সঙ্গে: – অনিশ্চিত কাজ – ভরসাহীন যাতায়াত – ছড়িয়ে থাকা হিংসা – নাগালের বাইরে খরচ – মজবুত সামাজিক বন্ধনের অভাব – পরিবারের পুরো দায়িত্ব।

যেখানে কাজ পায় সেখানেই কাজ করে: সুপারমার্কেট, ক্লিনিক, কল সেন্টার, রেস্টোরাঁ, স্থানীয় সমবায়।

তার অনুপস্থিতি শহুরে: সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত এক শহর, কিন্তু যারা তাকে দাঁড় করিয়ে রাখে তাদের দিকে সে তাকায় না।

ডেট্রয়েট তার শিল্পের ইতিহাস উদ্‌যাপন করে। তার ব্যর্থতা থেকে যে নারীরা বেঁচে ফিরেছে, তাদের উদ্‌যাপন করে না।

ফ্লিন্টের নারী – 34 বছর

ফ্লিন্ট এক জাতীয় ক্ষত। বছরের পর বছর বিষাক্ত জল, বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত শিশু, রাজ্যের হাতে প্রতারিত পরিবার।

এখানকার নারী কেলেঙ্কারিটা নিজের গায়ে বেঁচেছে: – সে বিষাক্ত জলে রান্না করেছে – সে বিপজ্জনক জলে সন্তানদের স্নান করিয়েছে – সে প্রমাণ অস্বীকার করা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লড়েছে – সে স্বাস্থ্যবিধির বিরাট সমস্যা নিয়ে সংসার চালিয়েছে – তাকে বেছে নিতে হয়েছে বিল মেটানো আর বোতলের জল কেনার মধ্যে। তার অনুপস্থিতি পরিবেশের: রাজ্য ব্যর্থ হয়েছে, আর দাম দিয়েছে সে।

ফ্লিন্ট শুধু একটা ট্র্যাজেডি নয়। এটা দেখায়, আমেরিকায় এক গরিব নারীর জীবনের দাম কত সামান্য।

প্রাক্তন কারখানাগুলোর নারী – 46 বছর

একসময় মিশিগানের কারখানা দিত স্থিতি: ন্যায্য মজুরি, একটা বাড়ি, একটা পরিবার, একটা ভবিষ্যৎ।

তারপর সব ভেঙে পড়ল: বিদেশে কারখানা সরানো, রোবট, বন্ধ হয়ে যাওয়া, গণ ছাঁটাই।

এখানে নারীদের দ্রুত নিজেদের নতুন করে গড়তে হয়েছে: – সুপারমার্কেট – সেবাযন্ত্র – সাফাই – ছোটখাটো পরিষেবা – খণ্ডকালীন কাজ – ভাগ-করা শিফট।

ভারী শিল্প থেকে রোজকার অনিশ্চয়তায়।

তার অনুপস্থিতি অর্থনৈতিক: সে হারিয়েছে নিরাপত্তা, হারিয়েছে ভবিষ্যতের আশা, হারিয়েছে সেই সুরক্ষা, যা তার ছিল যখন গাড়ি পৃথিবী শাসন করত।

গ্রামের নারী – 50 বছর

গ্রামীণ মিশিগান বিশাল: হ্রদের অঞ্চল, বন, বিচ্ছিন্ন জনপদ, ধীরগতির ছোট শহর।

এখানে নারীকে সামলাতে হয়: – কঠোর শীত – স্বামী আর সন্তানদের নেশা – দূরের স্বাস্থ্যসেবা – মরসুমি কাজ – একাকিত্ব – প্রায় না-থাকা যাতায়াত।

এ এক অবিরাম মানিয়ে নেওয়ার জীবন। কোনো সহায়তা নেই, কোনো উন্নতি নেই, কোনো মজবুত বন্ধন নেই। তার অনুপস্থিতি ভৌগোলিক: সে হারিয়ে যায় কিলোমিটারের মধ্যে, নীরবতায়, টিকে থাকার রোজকার নিয়মে।

উপসংহার – মিশিগান

মিশিগান এমন এক রাজ্য, যা বয়ে চলে অতীতের দাগ আর বর্তমানের পরিণতি।

নারীরা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে: ডেট্রয়েট, ফ্লিন্ট, গ্রামাঞ্চল, প্রাক্তন কারখানা, কঠিন পাড়া, অদম্য পরিবার।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই তারা হারিয়ে যায়: – ভেঙে পড়া পরিকাঠামোর মধ্যে – দূষিত জলের মধ্যে – অনিশ্চিত কাজের মধ্যে –

আধখালি শহরের মধ্যে – ব্যর্থ অর্থনীতির মধ্যে।

মিশিগান তার গৌরবময় অতীত উদ্‌যাপন করে। বর্তমানের দাম দেয় নারীরা।

ভাবনা – মিশিগান

প্রতিটি রাজ্য অনুপস্থিতির আলাদা রূপ দেখায়। মিশিগান দেখায় সেটি, যার কারণ কাঠামোর ভঙ্গুরতা: কারখানা পড়লে সম্প্রদায় পড়ে। আর সম্প্রদায় পড়লে যে দাঁড়িয়ে থাকে, সে নারী—একা।

এখানে নারীর অনুপস্থিতি সারা জীবন ধরে ফাঁক বোজানোর ফল: কাজ, সম্ভান, বাসা, অর্থনৈতিক সংকট, পরিবেশ-বিপর্যয়, পরিষেবা ছাঁটাই আর শহুরে হিংসা।

এ সেই আমেরিকা, যা আর চলে না, অথচ আশা করে নারীরা তবু চলবে। আর সেই কারণেই এই অধ্যায়টা জরুরি।

মিনেসোটা

মিনেসোটা এমন এক রাজ্য, যাকে সবাই পছন্দ করে: হৃদ, প্রকৃতি, শৃঙ্খলা, শিক্ষা, সভ্যতা, লম্বা শীত আর এক “শান্ত” জীবন। বাইরে থেকে এটাই দেখা যায়।

ভেতর থেকে ছবিটা আলাদা। এটা এমন এক রাজ্য, যা বছরের অর্ধেক কাটায় হিমাক্ষের নিচে, যার সম্প্রদায়গুলো খোলা মনে হয় কিন্তু আসলে ভীষণ বন্ধ, যার শহরগুলো নিজেদের প্রগতিশীল বলে বিক্রি করে কিন্তু গভীর জাতিগত টানাপোড়েন লুকিয়ে রাখে, যার সমাজব্যবস্থা কাজ করে ততক্ষণই, যতক্ষণ তুমি কাজ করো—আর নারীরা সবসময় কাজ করে।

এখানে নারী বিশৃঙ্খলায় হারায় না। সে হারায় বাহ্যিক ভদ্রতায়। নীরবতায়। শীতলতায়। সেই “কোমল” প্রত্যাশায়, যা তাকে খোলাখুলি হিংসার চেয়েও বেশি পিষে ফেলে।

মিনেসোটা আক্রমণ করে না। খেয়ে ফেলে।

অভিবাসী পাড়ার নারী - 32 বছর

মিনেসোটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে চোখে-পড়া অভিবাসী সম্প্রদায়গুলোর একটি আছে: সোমালি, হমং, ইথিওপীয় আর লাতিনো। আর নারীরাই এই সম্প্রদায়গুলোর হৃৎপিণ্ড।

তারা বাঁচে দুই জগতের মাঝে: – নিজেদের মূল সংস্কৃতি – কঠোর আর ব্যয়বহুল আমেরিকান ব্যবস্থা। তারা কাজ করে: – স্বাস্থ্য-সহকারী হিসেবে – সাফাইকর্মী হিসেবে – খাবার পরিষেবায় – বেরিসিটার হিসেবে – গাড়িচালক হিসেবে – সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে।

তারা দুটো ভাষা বলে, সন্তান মানুষ করে, বড় বড় পরিবারকে টিকিয়ে রাখে। বিরামহীন।

তাদের অনুপস্থিতি সাংস্কৃতিক আর অর্থনৈতিক: তারা সম্প্রদায়ের চালিকাশক্তি, কিন্তু সমাজ তাদের দেখে শুধু পরিষেবা দেওয়ার উপস্থিতি হিসেবে।

সংখ্যা হিসেবে তারা দৃশ্যমান, মানুষ হিসেবে অদৃশ্য।

যে নারী সমাজসেবায় কাজ করে - 38 বছর

মিনেসোটা সমাজসেবায় অনেক টাকা ঢালে। কিন্তু আসল কাজটা যারা করে, তারা সবসময় নারী: পারিবারিক কেন্দ্রে, শিক্ষা প্রকল্পে, আশ্রয়কেন্দ্রে আর সরকারি প্রতিষ্ঠানে।

তাদের বলা হয় “সমাজের দেবদূত।” আসলে তারা কম বেতনের, অতিরিক্ত খাটুনির কর্মী।

বইতে কঠিন এমন সব গল্প, অবিরাম জরুরি অবস্থা, উপযুক্ত সরঞ্জাম ছাড়াই মানুষকে সাহায্য করা, সারাক্ষণ আবেগ সামলানো।

তাদের অনুপস্থিতি পেশাগত: তারা সমাজের সবচেয়ে ভঙ্গুর অংশটাকে ধরে রাখে, কিন্তু ব্যবস্থা তাদের ধরে রাখতে পারে না।

লম্বা শীতের নারী - 50 বছর

শীতের মিনেসোটা যেন অন্য এক গ্রহ: মাসের পর মাস বরফ, বরফে ঢাকা রাস্তা, বাধ্য হয়ে বিচ্ছিন্নতা। ভেতরের অঞ্চলে আর ছোট শহরে নারীরা বাঁচে: - সবকিছু থেকে কিলোমিটার দূরে - সামান্য স্বাস্থ্যসেবা - একঘেয়ে রুটিন - সহায়তার বন্ধন ছাড়াই ঘরের সমস্যা - এমন শীত, যা মাথার ভেতরেও ঢুকে পড়ে।

যখন তুমি দূরে, তুমি একা। আর মিনেসোটায় যখন তুমি একা, কেউ দেখে না।

তার অনুপস্থিতি ভৌগোলিক: সে হারিয়ে যায় বরফে, দূরত্বে, নীরবতায়।

অপরিহার্য খাত - 40 বছর

মিনেসোটা এমন এক রাজ্য, যা দাঁড়িয়ে আছে তিনটি স্তরের ওপর: - স্বাস্থ্যসেবা - শিক্ষা - খাদ্য বিতরণ।

তিনটিই নারীপ্রধান খাত। লম্বা শিফট, উঁচু মাত্রার দায়িত্ব, কর্মীর অভাব আর অবিরাম চাপ।

তাপমাত্রা -25-এ নামলে তারাই রাজ্যটা চালু রাখে। অসুস্থ হলেও তাদের বাদ দেওয়া যায় না।

তাদের অনুপস্থিতি কাজের: তারা থামতে পারে না, কিন্তু তাদের রক্ষা করার মতো কোনো ব্যবস্থা কেউ গড়ে না।

উপসংহার - মিনেসোটা

মিনেসোটা এমন এক রাজ্য, যা বাইরে ঠান্ডা আর বাইরে উষ্ণ। নারীরা সবকিছু ভারসাম্যে রাখে: অভিবাসী সম্প্রদায়, সমাজসেবা, স্বাস্থ্যসেবা, স্কুল আর বিচ্ছিন্ন পরিবার।

তাদের অনুপস্থিতি তিনটি উপাদানে গড়া: - তুষার - নীরবতা - স্বীকৃতিহীন দায়িত্ব। কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, কোনো কোলাহল নেই, কোনো চমকপ্রদ হিংসা নেই। আছে শুধু এক গ্রাস-করা শান্তি।

ভাবনা – মিনেসোটা

প্রতিটি রাজ্য অনুপস্থিতির নিজস্ব রূপ দেখায়। মিনেসোটা দেখায় সবচেয়ে “ভদ্র” রূপটা: বাহ্যিক সৌজন্যের মধ্য দিয়ে মুছে ফেলা।

এখানে তোমার ওপর চিৎকার করে না। খোলাখুলি বাধা দেয় না। আক্রমণ করে না।

শুধু তোমাকে একা কাজ চালিয়ে যেতে ছেড়ে দেয়। আর তোমাকে সবসময় কাজ চালিয়ে যেতেই হবে।

মিনেসোটা সেই রাজ্য, যেখানে নারীরা অদৃশ্য হয়ে যায় দুর্বল বলে নয়, এত শক্ত বলে যে কেউ তাদের সাহায্য করে না।

আর এই কারণেই এই অধ্যায়টা জরুরি: দেখাতে যে “ভালো” রাজ্যেও বড় বড় অনুপস্থিতি আছে।

মিসিসিপি

মিসিসিপি গভীরতম দক্ষিণের হৃৎপিণ্ড। এটা এমন এক রাজ্য, যা আজও বয়ে চলে তার ইতিহাসের ভার: দাসপ্রথা, শিকড় গাড়া দারিদ্র্য, বিভাজন, পরিষেবার অভাব, নগণ্য পরিকাঠামো, অর্থাভাবে ঝুঁকতে থাকা শিক্ষা।

এটা সেই জায়গাগুলোর একটি, যেখানে নারী হয়ে জন্মানো মানে তিনটি বাধা নিয়ে শুরু করা: – উত্তরাধিকারে পাওয়া দারিদ্র্য – অনড় পারিবারিক ভূমিকা – এমন এক রাজ্য, যা কিছুই দেয় না। এখানে নারীরা কোনো ঘটনার কারণে হারিয়ে যায় না। তারা হারিয়ে যায়, কারণ তারা এমন এক সমাজে বাঁচে, যা কখনও তাদের রক্ষা করার জন্য গড়া হয়নি।

মিসিসিপিতে নারীর অনুপস্থিতি সম্পূর্ণ: অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্যের, রাজনৈতিক, জাতিগত।

এটা সেই রাজ্য, যেখানে নারীরা সব ধরে রাখে আর কিছুই পায় না।

ডেল্টার আফ্রিকান আমেরিকান নারী - 40 বছর

মিসিসিপি ডেল্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে গরিব জায়গাগুলোর একটি। সংস্কৃতি, সংগীত আর ইতিহাসে অসাধারণ সমৃদ্ধ, অথচ রাজনৈতিক অবহেলা, পরিষেবার অভাব আর বিপুল বৈষম্যে বিধ্বস্ত।

এখানে আফ্রিকান আমেরিকান নারী সম্প্রদায়ের ভরকেন্দ্র: – সে সন্তান আর নাতি-নাতনি মানুষ করে – সে দুর্বল স্কুলে কাজ করে – সে পরিবারের সেবাযত্ন করে – সে বৃদ্ধাশ্রমে শিফটে কাজ করে – সে বাড়ি আর প্রতিষ্ঠান সাফ করে – সে গোটা পাড়াকে টিকিয়ে রাখে।

সে না থাকলে ডেল্টা একদিনে ভেঙে পড়ত।

তার অনুপস্থিতি ঐতিহাসিক আর জাতিগত: রাজ্য কখনও তাকে কোনো কিছুর কেন্দ্রে রাখেনি। সে সব দেয়, কিছুই পায় না।

সবচেয়ে দরিদ্র গ্রামাঞ্চলের নারী - 48 বছর

গ্রামীণ মিসিসিপি বিশাল। ছোট ছোট শহর, দূরের বাড়ি, সর্বত্র গির্জা, আর প্রায় না-থাকা হাসপাতাল।

নারী বাঁচে এসবের সঙ্গে: – সবকিছু থেকে মাইলের পর মাইল দূরে – চিকিৎসা-না-পাওয়া দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা – নগণ্য যাতায়াত – মরসুমি বা অনিশ্চিত কাজ – পুরোনো, রক্ষণাবেক্ষণে কঠিন বাড়ি – এমন বিচ্ছিন্নতার বোধ, যা জীবনের ধরন হয়ে যায়।

কোনো জরুরি অবস্থা হলে কেউ সময়মতো পৌঁছায় না।

তার অনুপস্থিতি ভৌগোলিক: সে এত দূরে থাকে যে তার কাছে পৌঁছানো যায় না, আর এত গরিব যে তার কথা শোনা হয় না।

যে নারী সবচেয়ে নিচু পরিষেবায় কাজ করে - 33 বছর

মিসিসিপি দেশের সবচেয়ে কম মজুরির রাজ্যগুলোর একটি। আর এই কাজগুলো অবধারিতভাবে নারীদের।

এখানে নারী কাজ করে: – সস্তা চেইনে – সস্তা সুপারমার্কেটে – ফাস্ট-ফুড রেস্টোরাঁয় – সাফাইয়ে – অসুস্থ আর বয়স্কদের অনানুষ্ঠানিক

সেবাযত্নে – নথিভুক্ত-না-হওয়া বেবিসিটিংয়ে।

কঠিন শিফট, কোনো অধিকার নেই, কোনো স্থির সময় নেই। সে খাটে খুব, পায় সামান্য, আর টিকে থাকে।

তার অনুপস্থিতি অর্থনৈতিক: তার কাজ ছাড়া মিসিসিপি ধীরে ধীরে থেমে যায়, কিন্তু রাজ্য তার সঙ্গে এমন আচরণ করে যেন যে কেউ তার জায়গা নিতে পারে।

ধর্মীয় ঐতিহ্যে আটকে পড়া নারী – 55 বছর

মিসিসিপিতে ধর্ম একটা উপাদান নয়। এটা একটা ব্যবস্থা।

এখানে নারীকে হতে হবে: – মা – ভক্তিমতী – পরিবারের ভরসা – নৈতিক আদর্শ – “শক্ত”, এমনকি যখন সে শক্ত নয়।

সে কলঙ্ক ছাড়া আলাদা হতে পারে না। বিচারের ঝড় না তুলে নিজের জীবন বদলাতে পারে না। পরিবারের আগে নিজেকে রাখতে পারে না।

তার অনুপস্থিতি সাংস্কৃতিক আর আবেগের: তাকে বড় করা হয়েছে সবাইকে ধরে রাখার জন্য, কিন্তু তাকে কেউ ধরে রাখে না।

উপসংহার – মিসিসিপি

মিসিসিপি বদলাতে সবচেয়ে ধীর রাজ্য। আর এই ধীরগতিতে নারীরা হারিয়ে যায়।

তারাই স্কুল, দোকান, গির্জা, পরিবার আর সম্প্রদায় চালু রাখে। সরকার যা পারে না, তারাই তা একসঙ্গে ধরে রাখে।

তবু তারা হারিয়ে যায় এমন এক কাঠামোয়, যা কখনও তাদের কেন্দ্রীয় বলে মনে করে না।

এখানে অনুপস্থিতি দুর্ঘটনা নয়। এটা এক ঐতিহ্য।

ভাবনা - মিসিসিপি

প্রতিটি রাজ্য অনুপস্থিতির এক রূপ দেখায়। মিসিসিপি দেখায় সবচেয়ে পুরোনো আর সবচেয়ে নিষ্করুটা।

এখানে নারীরা শুধু অদৃশ্য নয়। তাদের ধরে নেওয়া হয় স্বাভাবিক বলে। তাদের মনে করা হয় এক প্রাকৃতিক সম্পদ: সবসময় হাতের কাছে, কখনও সুরক্ষিত নয়।

মিসিসিপি এক কঠোর সত্য দেখায়: ইতিহাস না বদলালে সবচেয়ে বড় দাম দেয় নারীরা।

এই কারণেই এই অধ্যায় খণ্ডটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলোর একটি: কারণ এটা দেখায় কী পড়ে থাকে, যখন রাজ্য গোটা প্রজন্মকে ফেলে চলে যায় আর আশা করে নারীরাই তাদের বাঁচাবে।

Ferdinando Frega